স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

অগ্রহায়ণ ১৪২৩ | ডিসেম্বর ২০১৬ | বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ২

@icddr_b icddrb company/icddrb www.icddrb.org

স্ট্রোক বা ব্রেইন অ্যাটাক

ডাঃ মোঃ বদরুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি

রবিন স্মিথ সেদিন রোজকার মতোই অফিস করছিলেন। হঠাৎ করেই এক সময় তাঁর শরীরের ডান পাশটা অবশ হয়ে যায়। সহকর্মীরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে একটি মাত্র ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং ঠিক সাতদিন পর সুস্থ হয়ে তিনি আবারো অফিসে আসেন। সহকর্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নেন এবং সবাই মিলে তাঁর ৫৫ তম জন্মদিন পালন করেন।

উপরের গল্পটি আপনাদের অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও পশ্চিমা বিশ্বের কিছু কিছু ইসকেমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী এভাবেই সেরে ওঠে। আমাদের দেশের চিত্র অবশ্য এরকম নয়। এই অভিনব চিকিৎসা আমাদের দেশেও সম্ভব যদি রোগীর মধ্যে স্ট্রোকের আলামত দেখা দেওয়ার ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা যায় এবং সেখানে যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ থাকে। কিন্তু স্ট্রোক সম্পর্কে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অনেকেই স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাককে একই অসুখ মনে করেন, অর্থাৎ তাঁরা এই দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। আসলে স্ট্রোক হলো মস্তিষ্কের অসুখ আর হার্ট অ্যাটাক হলো হৃৎপিণ্ডের অসুখ। আমাদের দেশে পঞ্চাশোর্ধ মানুষের মধ্যে স্ট্রোক যে একটি নীরব মহামারী সে বিষয়ে জনসচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

স্ট্রোক কী?

স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের কোনো অংশের নিষ্ক্রিয়তা। হঠাৎ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত (ইসকেমিক স্ট্রোক) সৃষ্টি হওয়ার ফলে বা রক্তক্ষরণের (হেমোরেজিক স্ট্রোক) কারণে মস্তিষ্কের একটি অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। একেই বলা হয় স্ট্রোক। বিশ্বে বছরে প্রতি লাখে গড়ে ৩০০ জন মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়।

স্ট্রোকের কারণ

১. **ইসকেমিক স্ট্রোক:** মস্তিষ্কের কোনো অংশের ধমনীর রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে বিভিন্ন কোষে রক্ত পৌঁছাতে না পারলে এই অবস্থাকে ইসকেমিক স্ট্রোক বলে।

২. **হেমোরেজিক স্ট্রোক:** উচ্চ রক্তচাপে মস্তিষ্কের কোনো অংশের ধমনী ফেটে গিয়ে সে অংশে রক্তক্ষরণ হলে তাকে হেমোরেজিক স্ট্রোক বলা হয়।

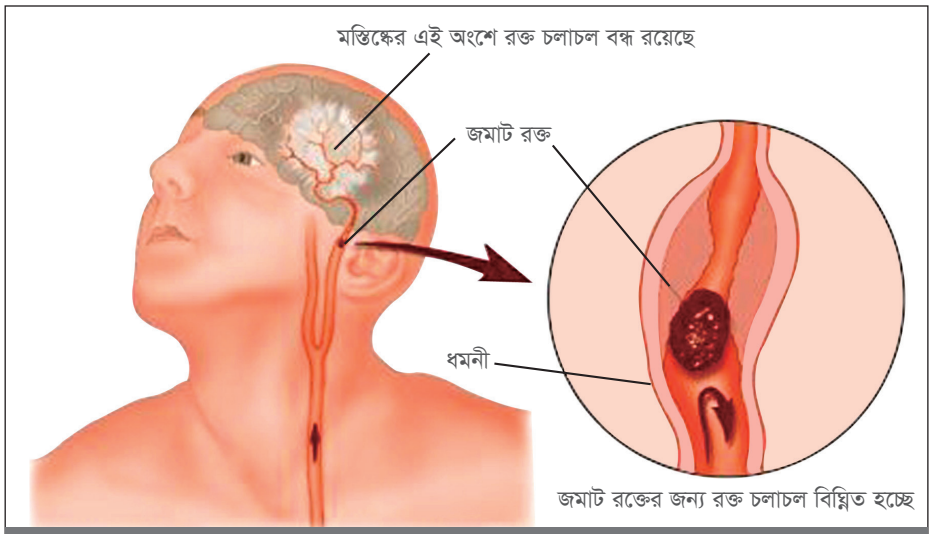

ইসকেমিক স্ট্রোক ■ সূত্র: ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস ■ ছবি: কনস্ট্রাকশনডিলএমকেটিং CC BY 4.0

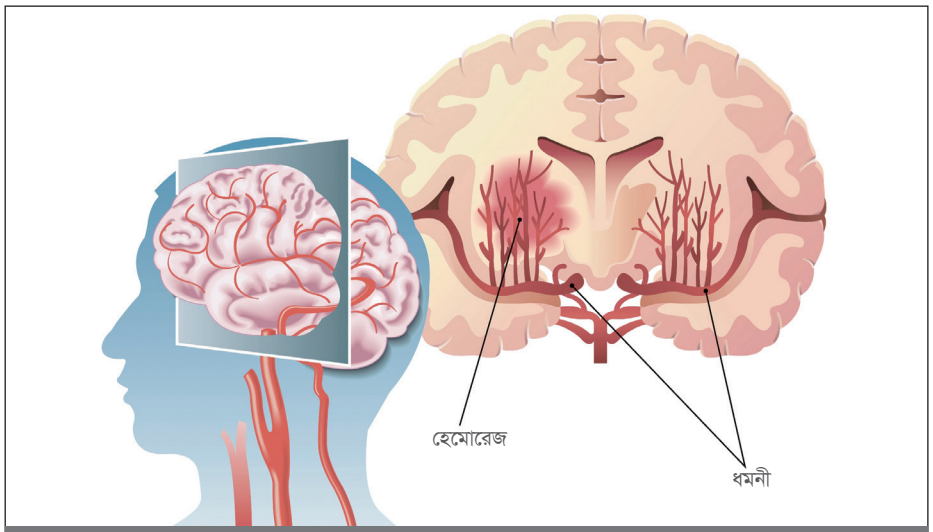

হেমোরেজিক স্ট্রোক ■ সূত্র: গুগল

উল্লেখিত দুই ধরনের স্ট্রোক বহু বছর ধরে চলতে থাকা কিছু শারীরিক সমস্যা ও অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত, যেমন:

- দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস
- দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ
- রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল
- ধুমপান
- অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান
- শরীরচর্চা বা ব্যায়ামহীন জীবন যাপন
- অতি মাত্রায় চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ

স্ট্রোকের লক্ষণ

প্রধানত কথা বলায় ব্যাঘাত ঘটা এবং শরীরের কোনো

ভেতরের পাতায়: লিভার সিরোসিস

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	অধ্যাপক জন ডি ক্লেমেন্স
প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
উপ-প্রধান সম্পাদক	ড. রুবহানা রকিব
সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ মোঃ ইকবাল, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

এক পাশ অবশ বা শক্তিহীন হয়ে পড়াই স্ট্রোকের লক্ষণ। এর সাথে নিচের উপসর্গগুলোও দেখা দিতে পারে:

- অজ্ঞান হয়ে পড়া
- খিঁচুনি হওয়া
- দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটা
- প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও বমি হওয়া
- শারীরিক বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা
- শরীরের এক পাশে হঠাৎ করে বোধের তারতম্য হওয়া

লক্ষ করার বিষয় হলো স্ট্রোক সবসময়ই শরীরের এক পাশকে আক্রান্ত করে, কখনোই চার হাত-পা আক্রান্ত হয় না।

রোগ নির্ণয় ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ

১. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে না রক্ত চলাচল বন্ধ আছে তা পরীক্ষার জন্য রয়েছে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই-এর ব্যবস্থা

২. মস্তিষ্কের ধমনীর গঠনগত ত্রুটি ধরার জন্য করতে হয় এমআরএ/ডিএসএ/এমআরভি

৩. হৃৎপিণ্ড বা গলার ধমনী থেকে জমাট রক্তপিণ্ড গিয়ে মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করেছে কি না তা জানার জন্য রয়েছে ইসিজি/ইকোকার্ডিওগ্রাম/গলার ধমনীর ডপলার পরীক্ষার ব্যবস্থা

৪. রক্তের গ্লুকোজ ও চর্বির মাত্রা নিরূপণ

৫. সিবিসি (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট)

৬. রক্তের লবণ বা ইলেক্ট্রোলাইটসের মাত্রা নিরূপণ

চিকিৎসা

রোগীর পরিবারের করণীয়

শারীরিক আলামত দেখে স্ট্রোক হয়েছে মনে হলে রোগীকে অতি সত্তর হাসপাতালে নিতে হবে। রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে যায় বা বমি করতে থাকে তাহলে তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে রোগীর বমি বা লালা শ্বাসনালীতে ঢুকে না যায়। সর্বাগ্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন রোগীর ঘাড় বা গলা বেঁকে গিয়ে কিংবা বমি বা লালার কারণে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে না যায়, কারণ তাতে রোগীর মস্তিষ্কে আরো বেশি অক্সিজেনের ঘাটতি হবে এবং তার অবস্থার আরো অবনতি হবে। রোগীকে পাশ ফিরানো অবস্থায় অনতিবিলম্বে হাসপাতালে নিতে হবে। অজ্ঞান রোগীকে কোনো অবস্থাতেই কোনো ওষুধ বা খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করা যাবে না।

হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা

স্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা

রোগী হাসপাতালে পৌছানোর সাথে সাথেই তার শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, রক্তচাপ, রক্তের গ্লুকোজ ও লবণের মাত্রা নিরূপণ করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে অপর্যাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে রক্তে অক্সিজেন কমে গেলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হতে পারে এবং রক্তচাপের মাত্রাতিরিক্ত তারতম্যের কারণে শিরাপথে ওষুধ প্রয়োগ করা লাগতে পারে। অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে নাকে নল দিয়ে তরল খাবার দিতে হবে এবং ক্যাথেটার দিয়ে প্রস্রাবের ব্যবস্থা করতে হতে পারে। রোগীর খিঁচুনি হলে যথাযথ খিঁচুনির ওষুধ দিতে হবে যা ছয় মাস এমনকি তার বেশি সময় ধরেও চলতে পারে। এছাড়া রোগীকে অবশ্যই দুই ঘণ্টা পরপর পাশ ফিরিয়ে দিতে হবে যেন পিঠে ঘা হয়ে না যায়। রোগীর জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধ দিয়ে এবং শরীর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে জ্বর কমাতে হবে। কোথাও সংক্রমণের আলামত থাকলে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। রোগীর রক্তচাপ, নাড়ীর গতি, রক্তের গ্লুকোজ, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসলে ফিজিওথেরাপি শুরু করতে হবে। বিশেষ করে শরীরের অবশ অংশের ফিজিওথেরাপি বা ব্যায়াম অত্যন্ত জরুরি। এতে অবশ অংশের বেঁকে যাওয়া যেমন প্রতিরোধ করা যায় তেমনি রোগী আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পায়।

সাধারণত চিকিৎসকেরা প্রথমেই সিটি স্ক্যান বা এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে স্ট্রোকের ধরন নির্ণয় করেন, কারণ ইসকেমিক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা।

ইসকেমিক স্ট্রোকের চিকিৎসা

১. **রক্তপ্রবাহ বাধাদানকারী জমাট রক্ত দ্রবীভূতকরণ:** স্ট্রোকের আলামত প্রকাশের প্রথম তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হয় তবেই কেবল এই চিকিৎসা সম্ভব। রিকম্বিনেন্ট টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর (আরটিপিএ) নামের ইনজেকশন দিয়ে এই চিকিৎসা করা হয়। সফল চিকিৎসায় রোগী কয়েক দিনেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগীই তিন ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছায় না। তিন ঘণ্টা পর এই ওষুধ দেওয়া যাবে না, কারণ তাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা বহুলাংশে বেড়ে যায়।

২. **মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয় অংশ অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণ:** মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে যদি রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে সেই অংশের কোষগুলো মরে গিয়ে মস্তিষ্ক ফুলে উঠতে পারে, যার ফলে মস্তিষ্কের চাপ বেড়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। এই অবস্থায় অপারেশন করে মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয় অংশ ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

হেমোরেজিক স্ট্রোকের চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীর চেতনা এবং সিটি স্ক্যানের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। অধিকাংশ রোগীই বিনা

স্ট্রোকে আক্রান্ত শয্যাশায়ী একজন রোগী ■ সূত্র: ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস ■ ছবি: ক্রিস উইটি CC BY-NC-SA 4.0

অপারেশনে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে রোগী যদি গভীরভাবে অচেতন হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের মাত্রা বেশি হয় তাহলে রোগীর জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে অপারেশন করে জমে থাকা রক্ত অপসারণ করলে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যায়। হেমোরেজিক স্ট্রোকের একটি বিশেষ ধরন হলো সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ, যা মস্তিষ্কের আবরণের দুই পর্দার মাঝে হয়। এটি সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের স্ট্রোক এবং এতে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি। এখানে ধমনীগাত্রের অস্বাভাবিক স্ফীত অংশ ফেটে রক্তক্ষরণ হয়। এক্ষেত্রে অপারেশন করে ক্লিপিং বা কয়েলিং-এর মাধ্যমে পরবর্তী রক্তক্ষরণ রোধ করা যায়।

স্ট্রোক প্রতিরোধ

যারা উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদেরকে নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে এই দু'টি রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এর পাশাপাশি ধুমপান পরিহার করা, নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা স্ট্রোক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। একবার স্ট্রোক হলে তা রোগীর পরবর্তী স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে স্ট্রোক-পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডোগ্রেল-জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করলে পরবর্তী স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস পায়। রোগীর যদি হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত গতি বা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে তবে তাকে অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডোগ্রেলের পাশাপাশি ওয়ারফেরিন-জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। সেক্ষেত্রে নিয়মিত রক্তের আইএনআর পরীক্ষা করিয়ে ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখা জরুরি। পাশাপাশি রক্তের চর্বি বা ফ্যাট কমানোর ওষুধও রোগীকে দীর্ঘ সময় ধরে খেতে হবে। বিশেষ করে যাদের পরিবারের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে স্ট্রোক, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস রয়েছে এবং যাদের বয়স ৪৫ বছরের বেশি তারা যদি উপরোক্ত বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলে তবে অনেক ক্ষেত্রেই স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব।

লিভার সিরোসিস

ডাঃ শেষানুজ চৌধুরী
বারডেম জেনারেল হাসপাতাল

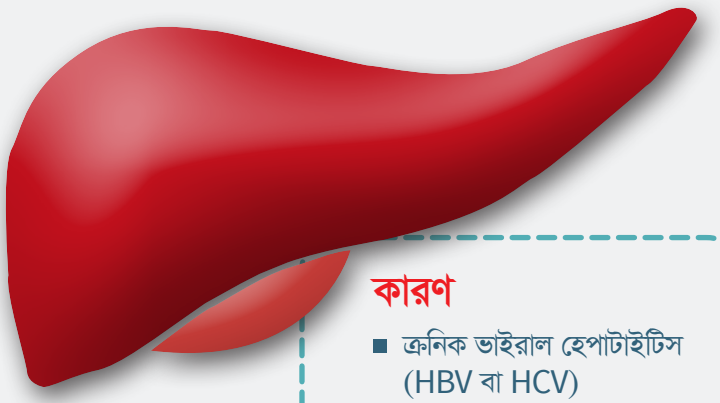

'লিভার সিরোসিস' লিভার বা যকৃতের মারাত্মক জটিল একটি রোগ। এতে স্থায়ীভাবে লিভারের গঠন প্রকৃতি এবং কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ-রোগে লিভার দিনদিন অকার্যকর হতে থাকে, ফলে শরীরে দেখা দেয় নানা রকম জটিলতা। এই জটিলতা সাধারণত এক দিনে সৃষ্টি হয় না, অনেক দিন ধরে ভুগতে ভুগতে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসা করা না হলে পরিণামে মৃত্যুও হতে পারে। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত ২৫% রোগী রোগ নির্ণয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই মারা যায়। হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্তের হার বেড়ে যাওয়া, বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল পান করা, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন (ফাস্টফুড নির্ভরতা) শারীরিক স্থূলতা (অতিরিক্ত ওজন) এবং কায়িক পরিশ্রম না করার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যদিও বাংলাদেশে বছরে কতজন লোক লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয় তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই, তবে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের 'গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, হেপাটোবিলিয়ারি অ্যান্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজঅর্ডার' বিভাগের হিসাব মতে প্রতি মাসে গড়ে ৫০ জন লিভার সিরোসিসের রোগী বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে ভর্তি হয়।

কারণ

- ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস (HBV বা HCV)
- অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান
- নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার
- প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোল্যানজাইটিস
- প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস
- হিমোক্রোমাটোসিস
- উইলসন'স ডিজিজ
- ক্রিপ্টোজেনিক লিভার ডিজিজ

লক্ষণ ও উপসর্গ

- অত্যধিক দুর্বলতা
- ওজন কমে যাওয়া
- খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব এবং বমি
- পেটব্যথা
- পেট ও পা ফুলে যাওয়া, অর্থাৎ শরীরে পানি আসা
- চোখ ও প্রস্রাবের রং হলুদ (জন্ডিস হওয়া)
- রক্ত বমি ও কালো পায়খানা
- রক্তশূন্যতা
- রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যাওয়া
- হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া এবং আচরণে পরিবর্তন আসা
- যৌন শক্তি কমে যাওয়া

রোগ নির্ণয়

- কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি)
- যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষা
  ১. এসজিওটি, এসজিপিটি, সিরাম বিলিরুবিন, অ্যালকালাইন ফসফেটেইস, সিরাম অ্যালবুমিন
  ২. প্রোথ্রোম্বিন টাইম
  ৩. ভাইরাস মার্কার্স (বিশেষ করে HBsAg এবং Anti HCV)
- পুরো পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম
- গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের উর্ধ্বাংশের এন্ডোসকপি
- সিরাম-অ্যাসিটেস অ্যালবুমিন গ্র্যাডিয়েন্ট (এসএএজি)
- ফাইব্রোস্ক্যান
- যকৃতের বায়োপসি

চিকিৎসা

লিভার সিরোসিস সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ নয়। তবে সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এর জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘ দিন ভালো থাকা যায়। লিভার সিরোসিসের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল। এ-রোগের সর্বশেষ চিকিৎসা লিভার প্রতিস্থাপন (ট্র্যান্সপ্ল্যানটেশন)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বারডেম হাসপাতালে ২০১০ সালে প্রথম সফলভাবে লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত একজন রোগীকে প্রাথমিকভাবে যেসব পরামর্শ দিয়ে থাকেন:

- নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা
- পানি ও লবণ কম খাওয়া, বিশেষ করে যাদের পেটে ও পায়ে পানি জমে তাদের ক্ষেত্রে
- ঘুম এবং ব্যথার ওষুধ, বিশেষ করে এনএসআইডিএস (ননস্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস) না খাওয়া
- এসিডিটি এবং বমি বমি ভাব কমানোর জন্য ওমিপ্রাজোল এবং ডমপিরিডোন গ্রুপের ওষুধ খাওয়া
- পোর্টাল হাইপারটেনশন কমানোর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রোপ্রানোলল গ্রুপের ওষুধ খাওয়া
- প্রয়োজনে রোগীকে রক্ত এবং অ্যালবুমিন দেওয়া
- ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে শর্ট অ্যাক্টিং রেগুলার ইনসুলিন ব্যবহার করা
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করা

হঠাৎ রক্ত বমি, কালো পায়খানা, অজ্ঞান ভাব, প্রস্রাব কমে যাওয়া, পেট অতিরিক্ত ফুলে যাওয়া, পেটব্যথা, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে জরুরিভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রতিরোধ

যেহেতু লিভার সিরোসিস নিরাময়যোগ্য রোগ নয় এবং এর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল সেহেতু শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই উত্তম। লিভার সিরোসিসের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য যেসব বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সেগুলো হলো:

সিরোসিসে আক্রান্ত সংরক্ষণকৃত লিভার ■ সূত্র: ফ্লিকার ক্রিয়েটিভ কমনস ■ ছবি: আলবারা মেহদার CC BY-NC 4.0

- হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের টিকা নেওয়া
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করা, অর্থাৎ রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে অবশ্যই হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' স্ক্রিনিং করানো
- অপরের ব্যবহৃত সুঁই, সিরিঞ্জ, ব্লেড, টুথব্রাশ, রেজার, ইত্যাদি ব্যবহার না করা
- অ্যালকোহল ও মাদকদ্রব্য পরিহার করা
- প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- অত্যধিক চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা
- নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- অনিরাপদ যৌন সঙ্গম না করা
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা
- গর্ভবতী মায়েদের হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' পরীক্ষা করা
- কবিরাজী, ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র, ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা
- হাসপাতালে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত ব্লাড সেট, স্যালাইন সেট, সুঁই, সিরিঞ্জ এবং পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা ধরার সময় গ্লাভস ব্যবহার করা এবং সেগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে অপসারণ করা

লিভারের যেকোনো সমস্যার জন্য যত দ্রুত সম্ভব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ সঠিক চিকিৎসার অভাবে তা সিরোসিসে রূপান্তরিত হতে পারে। আক্রান্ত রোগীদেরকে অবশ্যই সবসময় একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় সামান্য অবহেলা বা অনিয়ম ডেকে আনতে পারে ভয়ঙ্কর পরিণতি।

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান

যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।

ISSN 1021-2078